মৎস্য সপ্তাহ' ৯৭

১৬-২২ সেপ্টেম্বর

খাদ্য অর্থ স্বাস্থ্য পেতে চাষ করুন মাছ সব জলাতে

মৎস্য অধিদপ্তর
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

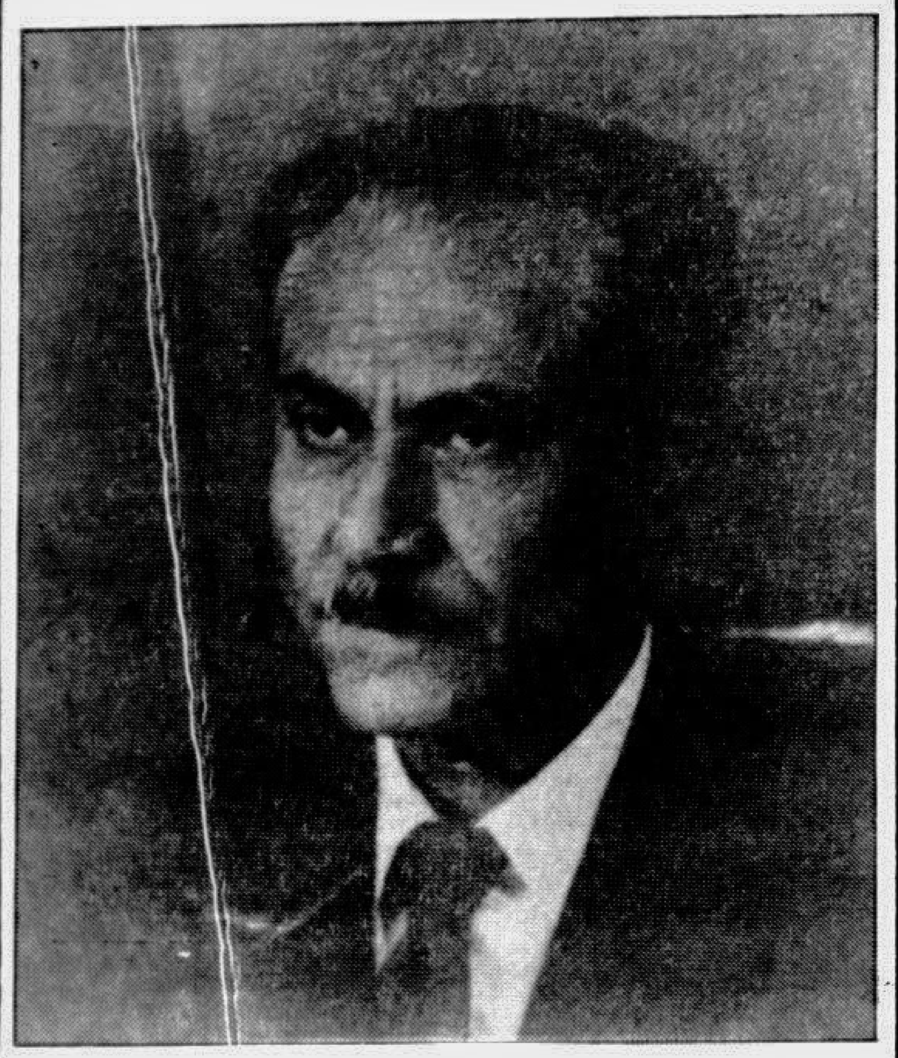

বাণী

আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে নিজস্ব সম্পদের সর্বাত্মক ব্যবহারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে সচেষ্ট হওয়া সকলের কর্তব্য। এই প্রেক্ষাপটে মৎস্য খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সরকার অন্যান্য বছরের মত এবারও "মৎস্য সপ্তাহ'৯৭" উদযাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত। দেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এলে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে। মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও মৎস্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণের সাথে সাথে মৎস্য চাষে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে এই সপ্তাহ বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি।

আমি "মৎস্য সপ্তাহ'৯৭"-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

মাছ, চিংড়ি ও জলজ পরিবেশ

ডঃ এম. এ. মজিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশের ভূখন্ডে দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে রয়েছে বিস্তৃত জলাভূমি। এর ভেতর শস্য উৎপাদনযোগ্য জমির শতকরা ৪০ ভাগ মিঠাপানি বা অভ্যন্তরীণ জলাশয়। এই সুবিশাল জলাশয়ে প্রচুর মৎস্য উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও মাছের সরবরাহ বর্তমানে অনেক কম। এর প্রধান কারণ শস্য উৎপাদনে অপরিমিত পানি সেচ যা ভূপৃষ্ঠস্থ মিঠাপানির দুই-তৃতীয়াংশই শুষে নিচ্ছে। ভূপৃষ্ঠস্থ অগভীর জলাশয় বা প্লাবনভূমির সঞ্চিত পানি সিঞ্চন কার্যে নিঃশেষিত হওয়ার পর গভীর নলকূপের সাহায্যে পানি উত্তোলনের ফলে ক্রমান্বয়ে পানির স্তর নিচে নামতে থাকায় অনেক গভীর নলকূপেই আজ আর পানি উঠে না। অন্যদিকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ জলাভূমির সংকোচনের ধারা অব্যাহত রেখেছে। আবার শস্য রক্ষায় নানা প্রকার কীটনাশকের ব্যবহার এবং কলকারখানার বর্জ্য পদার্থের নির্গমন জলজ পরিবেশের অবক্ষয় ত্বরান্বিত করেছে। এর অবশ্যম্ভাবী প্রভাব পড়েছে মাছের ওপর। পত্র-পত্রিকায় মাছের আকাল এবং অগ্নিমূল্য নিয়ে আজকাল প্রায়শই লেখালেখি হয়ে থাকে। পানি না থাকলে মাছ থাকবে না এটি অতি সাধারণ কথা। অতএব, মাছের আকাল রোধ করতে হলে পানি ধরে রাখতে হবে এবং এর পরিবেশসম্মত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু এ নিয়ে কি ভোক্তা, কি পেশাজীবী, কি নীতি নির্ধারক, কেউ-ই খুব সচেতন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী পানি সমস্যাই হবে প্রকটতম সমস্যা, যা নিয়ে উন্নত দেশসমূহে ইতোমধ্যেই ব্যাপক চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। আর মাত্র তিন বছর পর আমরা একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করতে যাচ্ছি। কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে এদেশের ১২ কোটি মানুষের পানি সমস্যা কিভাবে মোকাবেলা করা যাবে, পানি নির্ভর শস্য ও মৎস্য উৎপাদন ব্যবস্থা কিভাবে চালু রাখা যাবে, তা নিয়ে ব্যাপক চিন্তাভাবনা আমরা করছি না। পানি সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উপযুক্ত কৌশল নিয়ে আমরা যদি একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করতে না পারি তাহলে পানির অভাবে একবিংশ শতাব্দীতে আমাদের বেঁচে থাকাই কঠিন হয়ে পড়বে। বিষয়টি মনে রেখে এখনই আমাদের দীর্ঘমেয়াদী সমন্বিত পানি ব্যবহার ও উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

উৎস এবং পরিমাণের দিক থেকে বাংলাদেশে মিঠাপানির মাছেরই প্রাধান্য বেশী। কিন্তু প্রাকৃতিক উৎসে মিঠাপানির মাছের প্রাপ্যতা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। কেউ কেউ মনে করেন অতি আহরণ এর প্রধান কারণ। আসলে তা নয়। বরং শস্য উৎপাদনে অতি মাত্রায় প্লাবনভূমির পানি প্রত্যাহার সমূলে মৎস্যকূলের মজুদ বিনাশ তথা প্রাপ্যতা হ্রাসের বড় কারণ। এ প্রেক্ষাপটে একমাত্র বড় নদী ছাড়া ছোট ছোট নদীসহ অন্যান্য অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছের প্রাকৃতিক মজুদের নবায়ন আজ প্রায় বন্ধ। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের মাধ্যমে মাছের প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস ও প্রজনন অভিপ্রায়ণ বাধাগ্রস্ত হওয়ার ফলে প্লাবনভূমিতে মাছের স্বাভাবিক বংশ বিস্তার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অদূরদর্শী পানি-নীতি অথবা সঠিক নীতি-বিহীন পানি উন্নয়ন পরিকল্পনা স্বাভাবিক জলজ উৎপাদন ব্যবস্থাকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য দায়ী বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

উষ্ণ জলবায়ু, প্রচুর বৃষ্টিপাত ও সুবিস্তৃত বিভিন্ন প্রকার জলজ পরিবেশের কারণে জলজ জীব-বৈচিত্রে বাংলাদেশ অত্যন্ত প্রাচুর্যশীল। এদেশের বিস্তৃত জলাশয়ে ২৬০ প্রজাতির মিঠাপানির মাছ, ৪৭৫ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ, ৫৬ প্রজাতির সামুদ্রিক ও মিঠাপানির চিংড়ি এবং নানা প্রকার কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক, কুমীর, বেঙ, কচ্ছপসহ আরোও অনেক প্রকার ছোট বড় জলজ প্রাণী রয়েছে। অথচ এই মূল্যবান জলজসম্পদ প্রথমতঃ মানুষের অবিবেচক আচরণ এবং দ্বিতীয়তঃ সম্পদ ধারণকারী জলজ পরিবেশ ও তাতে বিদ্যমান প্রাণিজসম্পদের অব্যবস্থাপনার কারণে বিনষ্ট হচ্ছে। জলজ জীব-বৈচিত্র পানির নীচে থাকে বিধায় দেখতে পাওয়া যায় না। একারণে একেবারে ধ্বংস বা নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিটা সম্যক বুঝা যায় না। এভাবে আমাদের দেশে ইতোমধ্যে কত মূল্যবান মৎস্য প্রজাতির অবলুপ্তি ঘটেছে তার কোন বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা এ পর্যন্ত করা হয়নি।

জীব-বৈচিত্র বিনষ্টের কারণ

প্রধানতঃ (১) আবাসস্থলের সংকোচন ও অবক্ষয় (২) অতি আহরণ (৩) বিদেশী মৎস্য প্রজাতির বিস্তার (৪) পরিবেশ দূষণ (৫) জলবায়ুর পরিবর্তন, ইত্যাদি কারণে প্রাকৃতিক জীব-বৈচিত্র ও তার গতিশীলতা বিনষ্ট হয়ে থাকে। এ সকল অবস্থাসমূহ পরিবেশের বিবর্তন ত্বরান্বিত করে যা একটি নির্দিষ্ট জলাশয়ে বিদ্যমান মৎস্য জনগোষ্ঠির গঠন ও তার সার্বিক জীবন ধারণ প্রক্রিয়ায় বিরূপ প্রভাব ফেলে। ফলে পরিবর্তিত পরিবেশে ইতোমধ্যে বিপন্ন প্রজাতি নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরে বিলুপ্তির দিকে ধাবিত হয়।

জলজ পরিবেশ অত্যন্ত ভংগুর ও নাজুক। মানুষের যথেচ্ছা ব্যবহারের কারণেই জলজ পরিবেশ বিনষ্ট হয়ে অনেক ক্ষেত্রে স্থায়ী ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। উন্নয়ন কর্মকান্ডের পাশাপাশি অমোঘ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় আজ মৎস্য উৎপাদনের উৎসগুলো যথা–হাওড়-বাওড়, খাল-বিল, নদী-নালা ইত্যাদির সংকোচন, অবক্ষয় ও পলিজনিত ভরাটের কারণে মাছের আবাসস্থল মৎস্যসম্পদের জন্য ক্রমশ অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। এভাবে মূল জলজ পরিবেশ রূপান্তরিত হতে হতে এক সময় তা পুরোপুরি ধ্বংসও হয়ে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অপরিকল্পিত চিংড়িচাষের কারণে উপকূলীয় প্যারাবন ও পরিবেশ আজ মারাত্মক হুমকীর সম্মুখীন। যথাযথ সংস্কারের মাধ্যমে এর পুনর্বাসন আবশ্যক। জলাশয়ের সংকোচন রোধ, সংস্কার ও সংরক্ষণ কাজ আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে অবশ্যই সরকারি ব্যয়ে করতে হবে। অন্যথায় পানি উন্নয়ন বিষয়ক কর্মকান্ড কোন সুফল বয়ে আনবে না।

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না হওয়ায় এবং মুক্ত জলাশয়ে ঐতিহ্যগতভাবে সকলের মৎস্য আহরণের অবাধ অধিকার থাকায় আহরণকারীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবেও মাছের মজুদ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে।

বিদেশী মাছের আমদানি

আজকালকার মৎস্যচাষীরা খুবই উদ্যোগী। ফলে তারা উৎপাদন বৃদ্ধি ও মৎস্যচাষকে অধিক লাভজনক করে তোলার প্রয়াসে উন্নত জাতের মৎস্য প্রজাতি আমদানি করতে ব্যস্ত। উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনে অধিক উৎপাদনশীল মাছ আমদানি করা যাবে না এ কথা কেউ বলছে না। তবে আমদানিকৃত মাছের বিস্তারে দেশী মাছের ক্ষতি সাধন হোক তাও কারো কাম্য নয়। দেশী মাছের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তবেই কোন নির্দিষ্ট বিদেশী প্রজাতির মাছ আমদানির অনুমোদন দেওয়া বাঞ্ছনীয় হবে।

এ যাবৎ বাংলাদেশে ১৩টিরও বেশী বিদেশী প্রজাতির মাছ আমদানি করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে থাই পাঙ্গাশ, আফ্রিকান মাগুর, থাই সরপুটি, কমন কার্প, গ্রাসকার্প, সিলভার কার্প, ব্লাক কার্প, বিগ হেড কার্প, তেলাপিয়া অন্যতম। এর বেশ কয়েকটি মাছের খাদ্যাভাস এবং আবাসস্তর খামার পরিবেশে আমাদের দেশী কয়েকটি মাছের অনুরূপ হওয়ায় খাদ্য গ্রহণ ও আবাসস্থলের প্রতিযোগিতার কারণে কতিপয় দেশীয় প্রজাতির মাছ আজ বিপর্যয়ের সম্মুখীন। অপরদিকে দেশীয় পরিবেশে খাপ খাওয়াতে না পেরে আমদানিকৃত বেশ কয়েকটি প্রজাতির মাছ আমাদের দেশীয় পরিবেশে স্থিতিশীলতা লাভ করতে পারে নাই। আমদানিকৃত একটি মাছ এমন কোন রোগ বহণ করে নিয়ে আসতে পারে যে রোগের প্রতি দেশীয় মাছের প্রতিরোধ ক্ষমতা নেই। এর ফলে প্রাকৃতিক মৎস্য ভান্ডারে ব্যাপক মড়ক দেখা দিতে পারে। সাম্প্রতিককালে মিল্ক ফিশ ও জাপানীজ চিংড়ি (পিনিয়াস জেপোনিকাস) এ দেশে আনা হয়েছে বলে জানা যায়। মৎস্য খামার এবং প্রাকৃতিক জলজ পরিবেশের মধ্যে পরিবেশগত কারণে নিবিড় যোগাযোগ থাকায় আমদানিকৃত মাছ প্রাকৃতিক জলাশয়ে চলে যেতে পারে যার ফলে আবাসস্থলের প্রতি-যোগিতাসহ দেশী মাছের প্রভূত ক্ষতিসাধনের মত চরম বিপদ ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা সর্বদাই বিদ্যমান থাকে। কাজেই পরিবেশ এবং রোগ বিস্তার-উভয় কারণেই বিদেশী মাছের আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক।

বিপন্ন প্রজাতির কয়েকটি দেশীয় মাছ

পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্রের বিপর্যয়ের প্রকৃত অবস্থা ও বিবর্তনের ধারা অনুধাবন করা অত্যন্ত জটিল বিষয়। কারণ, এ দেশে অনেক পানি উন্নয়ন তথা বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে, মৎস্য জীব-বৈচিত্রে যার প্রভাব আদৌও নিরূপণ করা হয়নি। কিন্তু এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া যে পড়েছে তা বিল-বিলান্তিতে মাছের অভাব থেকে কারোও বুঝতে অসুবিধা হয় না। প্রায় ২০/২৫টি দেশীয় প্রজাতির মাছ আজ বিপন্ন অথবা বিপদগ্রস্ত অবস্থায় আছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। এর মধ্যে রয়েছে মহাশোল, নান্দিনা, গণিয়া, সরপুটি, শোল, গজার, বাইম, গুতুম, চিতল, ফলি, বাঙ্গনা, খলিশা, চান্দা ইত্যাদি। পরিবেশের অবক্ষয় ও বিবর্তন, রোগের বিস্তার, দেশী মাছের সাথে আমদানিকৃত মাছের খাদ্য গ্রহণের প্রতিযোগিতা, ইত্যাদি কারণে উল্লেখিত মাছগুলো এক বিপর্যয়কর অবস্থায় রয়েছে। জলাশয়গুলো পুরো মাত্রায় পানি সেচে শুকিয়ে ফেলায় প্লাবনভূমির এ সকল মাছের জার্মপ্লাজম ক্রমান্বয়ে বিপন্ন হতে চলেছে। বিপন্ন এ সকল মাছ সংরক্ষণকল্পে কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবনের মাধ্যমে উৎপাদিত পোনা মুক্ত জলাশয়ে অবমুক্ত করে হারিয়ে যাওয়া সম্পদ পুনরুদ্ধারের আশু ব্যবস্থা নেয়া দরকার। যদি এ ধরনের সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয় তাহলে গৃহীত ও গৃহীতব্য পানি উন্নয়ন প্রকল্পের স্বল্পমেয়াদী সুখ অবশেষে দীর্ঘমেয়াদী দুঃখের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে।

জীব-বৈচিত্রের বিলুপ্তিজনিত ক্ষতি অনেক ক্ষেত্রেই পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় না। ক্ষেত্রবিশেষে সম্ভব হলেও তা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও ব্যয় নির্ভর হয়ে পড়ে। অতএব, এই মর্মে সচেতনতা গড়ে তোলা দরকার যে, জলাশয়ের জৈবিক উৎপাদনশীলতার ভিত হিসেবে পরিগণিত প্রাকৃতিক জীব-বৈচিত্র খুবই বিপর্যয়ের সম্মুখীন। এই 'জেনেটিক জীব-বৈচিত্র' সম্পদ সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলে যে ক্ষতি সাধিত হবে তা মোকাবেলা করা আদৌ সম্ভব হবে না। তাই দেশের জৈবিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ অপরিহার্য।

মৎস্য, মৎস্যসম্পদের উৎস এবং মৎস্যচাষ জলজ পরিবেশ সংরক্ষণের সূচক হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সংগত কারণেই মৎস্যচাষী এবং মৎস্যজীবীরা পরিবেশ সমীক্ষা ও জলজ জীব-বৈচিত্রের পরিবর্তনের স্থায়ী পর্যবেক্ষক ও পরিদর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ প্রাকৃতিক উৎসে মৎস্যজীবীরা মৎস্য শিকার করে থাকে আর পুকুরে মাছচাষ করে থাকে মৎস্যচাষীরা। অতএব, তারা তাদের আয় এবং জীবনযাত্রার জন্য এর ওপরই নির্ভরশীল। কোন সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের পক্ষে এককভাবে এই বিশাল ও বিস্তৃত সম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, এ প্রচেষ্টায় মৎস্যজীবীদের সম্পৃক্ত করা অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই প্রয়োজন। সেই সাথে প্রয়োজন পরিবেশবিদ, মৎস্যবিদ, উদ্ভিদবিদ ও সম্পদ ব্যবস্থাপনাবিদের সম্মিলিত অংশগ্রহণ।

আধা-নিবিড় চিংড়ি চাষ ও পরিবেশ

বর্তমান দশকের গোড়ার দিকে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশে আধা-নিবিড় চিংড়ি চাষ শুরু হয়। এতে পোনা ও খাদ্যের চাহিদা বহুগুণ বেড়ে যায়। ফলে শুরু হয় চিংড়ি পোনা ও খাদ্য আমদানি। আধা-নিবিড় চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি আয়ত্বে না থাকায় ব্যবস্থাপনা ত্রুটির কারণে ১৯৯৪ সনে ভাইরাস রোগে আক্রান্ত হয়ে চিংড়ির ব্যাপক মড়ক দেখা দেয়। এতে চিংড়ির পরিকল্পিত অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্ত হয়। অপরিকল্পিত চিংড়ি চাষ দ্রুত সম্প্রসারণে বর্ধিত চাহিদা মিটাতে উপকূলীয় নদীগুলোতের চিংড়ি পোনার আহরণ ব্যাপক প্রসার লাভ করে। অধিক সংখ্যক নারী-পুরুষ পোনা আহরণ কাজে লিপ্ত হয়। ফলে উপকূলীয় নদীগুলোতে এর প্রাপ্যতা হ্রাস পেতে শুরু করে। দ্রুত বেড়ে যায় পোনার মূল্য। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৯৫ সনে ভারত ও থাইল্যান্ড থেকে পোনা ও খাদ্য আমদানি শুরু হয়। চিংড়ির ভাইরাস রোগের আবির্ভাব, পোনা ও খাদ্য আমদানির সাথে সম্পৃক্ত থাকার বিষয়টি উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

অতি আহরণের সুদূর প্রসারী প্রভাবে চিংড়ি পোনা বয়োপ্রাপ্ত হয়ে সাগরে ফিরে যেয়ে বংশ বৃদ্ধি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে না পারায় প্রাকৃতিক চিংড়ি ভান্ডার ক্রমান্বয়ে শূণ্য হতে থাকে। শুধু কি তাই? মাৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের এক সমীক্ষায় দেখা যায়, একটি বাগদা চিংড়ির পোনা আহরণ করতে যেয়ে আরো ৫০টি অন্য প্রজাতির চিংড়ি ও মাছের পোনা বিনষ্ট করা হচ্ছে। এতে সৃষ্টি হচ্ছে প্রজাতিগত ভারসাম্য-হীনতা। তাই চিংড়ির পোনা আহরণ নিয়ন্ত্রণ না করলে শুধু চিংড়ি নয়, উপকূলীয় জলজ এলাকা ক্রমান্বয়ে সামগ্রিকভাবে মৎস্য শূণ্য হয়ে পড়বে। এতে ভবিষ্যতে একদিকে যেমন চিংড়ি চাষ বন্ধ হয়ে যাবে অন্যদিকে তেমনি পুষ্টির প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত মৎস্যের সরবরাহ হ্রাস পাওয়ায় মারাত্মক পুষ্টি সমস্যা দেখা দিবে। পোনা আহরণ নিয়ন্ত্রণ তাই অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

অধিক আর্থিক মুনাফার কারণে উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষ অপরিকল্পিতভাবে দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে। এতে নতুন নতুন কৃষি জমি চিংড়ি চাষের আওতায় আসছে। ফলে শস্য উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, পানিয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে, লোনাপানির প্রভাবে ফলজ গাছপালা মরে যাচ্ছে এবং চারণ ভূমির অভাবে গবাদিপশুর লালন-পালনে সংকটাবস্থা দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে উপকূলীয় প্যারাবন পরিষ্কার করে চিংড়ি খামার গড়ে তোলায় উপকূলীয় মাছ ও চিংড়ির প্রাকৃতিক নার্সারি বিনষ্ট হওয়ায় জীব-বৈচিত্র বিনষ্ট হচ্ছে। অতএব, চিংড়ি খাতের স্থিতিশীল উন্নয়নের স্বার্থে চিংড়িচাষ কার্যক্রম সহনশীল পর্যায়ে সীমিত রাখতে হবে। সংগতি, সামর্থ ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের বাইরে চিংড়ি চাষ ও চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা সম্প্রসারণের জন্য অস্থির হয়ে পড়ার কোন যুক্তিসংগত কারণ আছে বলে মনে হয় না। উল্লেখ্য যে, কাঁচামালের অভাবে দেশে বিদ্যমান ১২৩টি চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা তাদের উৎপাদন ক্ষমতার মাত্র ১৫-২০ ভাগ ব্যবহার করতে পারছে।

আমরা জানি, মাছ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য হিসেবে মানুষের জীবন ধারণের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় উপাদান। কৃষিজ সম্পদের মধ্যে এটি পঞ্চম বৃহত্তম সম্পদ। বিশ্বের খাদ্য উৎপাদনের শতকরা ৭.৫ ভাগ মৎস্যসম্পদের অবদান এবং তা একশত কোটি লোকের আমিষের প্রধান উৎস। তাসত্ত্বেও বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশে প্রায় ৮০ কোটি মানুষের মৌলিক পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের সংস্থান নেই। বর্তমান বিশ্বে খাদ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি পেলেও তা স্বল্প আয়ের দরিদ্র মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। তাই বিশ্ব জুড়ে দারিদ্রতার অবসান ঘটাতে না পারলে ক্ষুধা এবং খাদ্য সমস্যা তথা খাদ্যের নিরাপত্তা সমস্যা শুধু রয়েই যাবে না, ভবিষ্যতে এর প্রকোপ আরোও বৃদ্ধি পাবে। এ প্রেক্ষাপটে ১৯৯৬ সালের নভেম্বরে রোমে অনুষ্ঠিত বিশ্ব খাদ্য নিরাপত্তা সম্মেলনে দারিদ্রতাকে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার প্রধান কারণ।

বাণী

কৃষি নির্ভর আমাদের দেশের অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই এ দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। দেশের বিস্তৃত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকার দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এ কর্মসূচীকে সামনে রেখে মৎস্য চাষকে একটি সামাজিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে তুলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার জন্য মৎস্য সপ্তাহ'৯৭ উদ্‌যাপনের আয়োজন করা হয়েছে। দেশের পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রাক্কালে এ প্রয়াস অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

দেশের মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, পরিচর্যা ও বৃদ্ধি সব কিছুই নির্ভর করে জনগণের সম্পৃক্ততার উপর। মৎস্য সপ্তাহ'৯৭ এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মাছ চাষে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও আগ্রহ সৃষ্টি এবং প্রযুক্তির সম্প্রসারণ। এ উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম জনগণের মাঝে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। ইতোমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা মৎস্য চাষে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা এবং মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণে করণীয় বিষয়ে জনগণকে ধারণা প্রদান করতে পারলে এবং জনগণ তা প্রয়োগ করে দেশের সকল জলাশয় মাছ চাষের আওতায় এনে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হলে মৎস্য সপ্তাহ'৯৭ এর উদ্দেশ্য সফল হবে বলে আমি মনে করি।

আমি মৎস্য সপ্তাহ'৯৭ এর সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সতীশ চন্দ্র রায়
প্রতি মন্ত্রী
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রাণীজ আমিষ সুষম খাদ্যের একটি প্রধান উপাদান এবং মৎস্য সম্পদ হচ্ছে এর অন্যতম প্রধান উৎস। মৎস্য আমাদের পুষ্টিচাহিদাই শুধু পূরণ করে না, এটি জীবিকারও এক প্রধান উৎস। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেরও অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র মৎস্য সম্পদ। এই জলজ সম্পদ বৃদ্ধি ও তার আহরণে আমাদের অবশ্যই যত্নবান হতে হবে।

সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচনে অবদান রেখে আসছে। আমরা আশা করি, তাদের ভূমিকা ক্রমান্বয়ে আরও ব্যাপক হবে।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে আমি মৎস্য সপ্তাহ'৯৭ এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত কারণে মৎস্য সম্পদ সমৃদ্ধ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে, বিপুল জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচনে, কর্মসংস্থানে, প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময়।

সময়ের আবর্তে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে "মাছে-ভাতে বাংগালী" প্রবাদ ভুলে যাবার উপক্রম হলেও সময় এসেছে আধুনিক লাগসই প্রযুক্তি নির্ভর করে সমস্যা উত্তরণের। তার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ব্যাপক গণ-সচেতনা ও জনসম্পৃক্ততার।

আমার বিশ্বাস, বিগত বছরগুলোর ন্যায় এবারও "মৎস্য সপ্তাহ'৯৭" এর কর্মপ্রবাহ মৎস্য বিষয়ক কর্মকান্ডে জনগণকে উদীপ্ত ও উজ্জীবিত করবে। "খাদ্য অর্থ স্বাস্থ্য পেতে/মাছ চাষ করুন সব জলাতে" এ প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে মৎস্য সপ্তাহ'৯৭ এর সফলতা কামনা করছি।

আইয়ুব কাদরী
সচিব
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সৌজন্যেঃ

Saudi - Bangladesh
Industrial and Agricultural
Investment Company Ltd.